৯০% ট্রেন লেটে চলে

বাংলাদেশের জন্য লেটে ট্রেন আসা স্বাভাবিক ঘটনা। জনগণের সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হবার পরও বাংলাদেশ রেলওয়ে যাত্রীদের জন্য প্রায়শই বিরক্তিকর। রেলওয়ের ৯০ শতাংশ ট্রেন লেটের কারণ অনুসন্ধান করেছেন **নোমান মোহাম্মদ**

আফজাল হোসেন সরকারি চাকরিজীবী। তার পোস্টিং দিনাজপুর। বাবা-মা থাকেন ঢাকাতেই। বাবার মারাত্মক অসুস্থতার খবর পেয়ে তিনি দ্রুত ঢাকায় রওয়ানা হলেন। মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষ। প্লেন ভ্রমণের বিলাসিতা তিনি দেখাতে পারেন না। টিকিট পাননি বাসেরও। অগত্যা ভরসা ট্রেন। সেই ট্রেন জায়গায় জায়গায় থেমে যাচ্ছে। কারণে-অকারণে দেরি করছে। টেনশন বেড়ে যায় আফজাল সাহেবের। বাবাকে শেষবারের মতো দেখতে পাবেন তো? সেই আন্তঃনগর ট্রেন একতা কমলাপুরে পৌঁছে নির্ধারিত সময়ের আড়াই ঘণ্টা পর। বাসায় ঢোকার আগেই তার কানে আসে কান্নার শব্দ। কিছুক্ষণ আগেই মারা গেছেন তার বাবা। আফজাল সাহেব ভাবলেন, সময় মতো ট্রেনটি এলে বাবাকে শেষ দেখা দেখতে পারতেন।

আফজাল হোসেনের ঘটনাটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। তার মতো এরকম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী। প্রায় প্রতিদিন প্রতিটি ট্রেন গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে দেরি করছে। ফলে কেউ হয়তো প্রিয়জনদের শেষবারের মতো দেখতে পারছেন না; কেউবা মিস্ করছেন তাদের জরুরি কাজ। কিন্তু কেন এই ভোগান্তি? প্রায় প্রতিটি ট্রেনই কেন গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে দেরি করছে? এর জন্য দায়ী কারা? দায়ী ব্যক্তিদের কখনো কি কোনোরকম শাস্তি দেয়া হয়েছে? সাপ্তাহিক ২০০০ তথ্যানুসন্ধান করে জানার চেষ্টা করেছে পেছনের কারণ।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ রেলওয়েতে যাত্রী পরিবহনের জন্য ছিল শুধু লোকাল ট্রেন। ফলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছতে সময় লাগতো অনেক। যাত্রীসেবার মানও আশানুরূপ ছিল না। এ বিষয়গুলো মাথায় রেখে ১৯৮৬ সালে চালু করা হয় আন্তঃনগর ট্রেন। উদ্দেশ্য, যাত্রীদের যেকোনো মূল্যে যথাসময়ে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়া। সেই সঙ্গে সর্বোচ্চ যাত্রীসেবা নিশ্চিত করা। শুরুতে বাংলাদেশ রেলওয়ে এ কাজে সফলও হয়েছিলো। কিন্তু সময়ের সঙ্গে বদলে গেছে এ চিত্র। এখন আন্তঃনগর ট্রেনেও পঁচিশ-ত্রিশ মিনিট লেট নিয়মিত ব্যাপার। কখনো কখনো এই লেট দুই-আড়াই ঘন্টাও ছাড়িয়ে যায়।

কারণ অনেক। প্রথমত, বাংলাদেশে বর্তমানে যে রেললাইন আছে তার অধিকাংশই ট্রেন চলাচলের অনুপযুক্ত। দু'একটা স্লিপারের ওপর দিয়ে পাথর ছাড়া এ রেললাইনে কিভাবে যে ট্রেনগুলো চলছে, তা চালকরাই ভালো বলতে পারবেন। একটি ট্রেন স্বাভাবিক অবস্থায় ঘন্টায় ৭২ কিমি গতিতে চলার কথা। কিন্তু রেললাইনের দুরবস্থার কারণে এই গতি কখনো কখনো ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ কিমিতেও নামিয়ে আনতে হয়। বিভিন্ন রেললাইনে অনেক সময় সংস্কার করা হয়। তখন কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত রেললাইনের ওপর দিয়ে ট্রেনের সর্বোচ্চ গতিসীমা নির্ধারণ করে দেয়। এটা হতে পারে ঘণ্টায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ কিমি। রেলের ভাষায় একে বলে রেস্ট্রিকশন। ঢাকা থেকে আখাউড়া, এই স্বল্প পথেই রয়েছে ১২টি রেস্ট্রিকশন। ফলে ট্রেন তার সর্বোচ্চ গতিসীমায় ওঠার আগেই রেস্ট্রিকশনে পড়ে যায়। নষ্ট হয় মূল্যবান সময়।

প্রতিটি রেল স্টেশনে স্টেশন মাস্টার, পয়েন্টস ম্যান, গার্ড থাকা আবশ্যক। কিন্তু তারা সব সময় তাদের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করে না। স্টেশন মাস্টার ও পয়েন্টসম্যানের অভাবে ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে রাতে প্রায় ২৫টি স্টেশন বন্ধ থাকে। কমলাপুর স্টেশনে তিন দিন গিয়েও স্টেশন মাস্টার মোহাম্মদ আলী কিংবা স্টেশন ম্যানেজার অশোক কুমার দে, কারো দেখা পায়নি এই প্রতিবেদক। তারাই যখন ঠিকভাবে ডিউটি করছেন না, তখন পয়েন্টসম্যান, গার্ডদের কথা না হয় বাদই দিলাম। কোনো স্টেশনের সিগন্যাল ক্লিয়ার করা না হলে ঐ স্টেশনের ওপর দিয়ে ট্রেন খুব ধীরে যায়। সিগন্যালম্যান না থাকলে তার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে ড্রাইভারকে রেললাইন দেখে ট্রেন নিয়ে এগোতে হয়। আবার যেখানে সিগন্যালম্যান আছে, সেখানকার যাত্রা যে নির্বিঘ্ন হয়, ব্যাপারটা এমনও নয়। ঢাকা, চট্টগ্রামসহ কিছু স্টেশনে আধুনিক কালারড লাইট সিগন্যালের ব্যবস্থা থাকলেও অধিকাংশ স্টেশনে এখনো ব্রিটিশ আমলের সিগন্যাল ব্যবস্থা

প্রচলিত। এই সিগন্যাল লাইটগুলো প্রায়শই অকার্যকর হয়ে থাকে। অকার্যকর হয়ে পড়ে ট্রেনের ইঞ্জিনও। পারাবতের যে ট্রেনের ইঞ্জিন অবিরাম ৭ ঘন্টা চলার পর ঢাকায় এসে পৌঁছেছে, তার স্বভাবতই কিছুটা বিশ্রাম প্রয়োজন। কিন্তু ইঞ্জিন স্বল্পতার কারণে এই ইঞ্জিনটিই হয়তো বা জয়ন্তিকায় জুড়ে দিতে হয়। জয়ন্তিকার অপেক্ষা করতে হয় কখন পারাবত আসবে, তার ইঞ্জিন পরীক্ষা হবে, এরপর সেই ইঞ্জিন নিয়ে তাকে ছুটতে হবে। মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে এই ইঞ্জিনটির মাঝপথে বিগড়ানো মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ট্রেনের আরো একটি বড় সমস্যা হলো কোচ/বগি সমস্যা। কোনো রেলওয়ের মোট কোচের অতিরিক্ত ২০% কোচ থাকার নিয়ম থাকলেও এখন তা ০%-এ এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে কোনো ট্রেনের একটি নির্দিষ্ট কোচ অকার্যকর হয়ে পড়লে অন্য ট্রেনের কোচ এনে তার সঙ্গে জুড়ে দিতে হয়। জানা গেছে, প্রায় প্রতিদিনই এরকম দু'একটি কোচ অকার্যকর হয়ে পড়ে। ফলে কোচ বদলেও কিছুটা সময় নষ্ট হয়ে যায়।

বাংলাদেশের অধিকাংশ রেলপথই সিঙ্গেল লাইন। অর্থাৎ সেখান দিয়ে শুধু একটি ট্রেনই চলাচল করতে পারবে। ডাবল বা সমান্তরাল আরো একটি লাইন না থাকার কারণে অনেক সময় ট্রেন কোনো কোনো স্টেশনে থেমে অপেক্ষা করতে থাকে। ঐ লাইনের ওপর দিয়ে আগে অপর একটি ট্রেন তাকে ক্রস করবে, তারপরই কেবল ঐ ট্রেনটি চলা শুরু করতে পারবে। অথচ ডাবল লাইন থাকলে ট্রেন যাওয়া-আসার কাজটি একই সময়ে করতে পারতো।

বাংলাদেশ রেলওয়ের অভ্যন্তরে ১১টি অন্তঃবিভাগ আছে। এর ভেতর ৪টি বিভাগ ট্রেন চলাচলের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। বিভাগগুলো হলো ট্রাফিক বিভাগ, মেকানিক্যাল বিভাগ, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ও সিগন্যাল বিভাগ। কিন্তু প্রতিটি বিভাগেই রয়েছে লোকবলের অভাব। রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলীয় বিভাগের শুধু ট্রাফিক সেকশনে যেখানে মোট জনবল প্রয়োজন ১৫১১, সেখানে তাদের আছে মাত্র ১২৭৯ জন। মারাত্মক স্বল্পতা রয়েছে স্টেশন মাস্টার, গার্ড ও গেটকিপারের ক্ষেত্রেও। স্টেশন মাস্টার, গার্ড ও গেটকিপার যেখানে প্রয়োজন যথাক্রমে ১৭৭, ৪২৭ ও ১৫২ জন, সেখানে রয়েছে মাত্র ১০৮, ৩৫০ ও ৬৪ জন। তবে মোট প্রয়োজন হিসেবে যে সংখ্যাটা দেখানো হয়েছে, সেটা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। বিভাগীয় পরিবহন অফিসার মোঃ হাবিবুর রহমানের মতে, 'এই সংখ্যাটা মোটেই পর্যাপ্ত না। তবুও এ ক'জন লোক হলে আমরা মোটামুটি কাজ চালিয়ে নিতে পারতাম।' তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, স্বাধীনতা যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৬৮,০০০। তখন কন্টেইনার ও আন্তঃনগর ট্রেন ছিল না। রেলওয়েতে এগুলোর সংযোগের ফলে আরো কর্মচারীর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা তো করা হয়ইনি, উপরন্তু লোকবল আশঙ্কাজনকভাবে কমানো হয়েছে। এখন রেলওয়ের কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৪০,০০০। ১৯৮৪ সালের পর আর কোনো নতুন নিয়োগ বাংলাদেশ রেলওয়েতে দেয়া হয়নি। এ কারণে যে ড্রাইভারটি ৭ ঘণ্টা ট্রেন চালিয়ে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় পৌঁছেছে, তাকেই আবার ৬ ঘণ্টা পর ট্রেন নিয়ে চট্টগ্রাম যেতে হয়। নিয়ম অনুযায়ী ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত ড্রাইভারকে বিশ্রাম দিতে হবে। কিন্তু বিভাগীয় পরিবহন অফিসার, চীফ ট্রেন কন্ট্রোলারের অনুরোধে তাকে ৬ ঘণ্টা পরই ট্রেন নিয়ে ছুটতে হয়। মোঃ হাবিবুর রহমানের মতে, 'এই লোকবল দিয়ে এরচেয়ে ভালো সার্ভিস দেয়া বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষে সম্ভব না।'

বাস মালিকদের সঙ্গে রেলের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাদের সুসম্পর্ক রয়েছে। সে কারণে রেলের সার্ভিস অনেক সময় খারাপ হয়। গন্তব্যে পৌঁছতে ট্রেন দেরি করে ফেলে। এ সম্পর্কিত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন হাবিবুর রহমান, 'রেলওয়েতে যারা মাঠ পর্যায়ে কাজ করে, সেসব পয়েন্টসম্যান, গার্ড, গেটকিপারদের তো আর টাকা দিয়ে কেনা সম্ভব না।' কিন্তু শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা? হাবিবুর রহমান জবাব দেন, 'রেলওয়েতে নেতার কথায় শ্রমিকরা চলেন না, বরং শ্রমিকের কথায় নেতারা চলেন। ফলে দুর্নীতির কোনো সুযোগ নেই।' ট্রেন সম্পর্কে আরো একটি সাধারণ অভিযোগ হলো, রেল কর্মচারীদের যোগসাজশে ট্রেনে চোরাচালানি করা হয়। অবৈধ পণ্য ওঠানো-নামানোর জন্য জায়গায় জায়গায় চেইন টেনে ট্রেন থামানো হয়। ফলে যাত্রীদের অযথাই সময় নষ্ট হয়। কিন্তু বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলীয় চীফ ট্রেন কন্ট্রোলার মোঃ ফজলুল হক। তার মতে, 'আমার সব কর্মচারী যে সৎ, সে কথা বলছি না। কিন্তু ঢালাওভাবে আমাদের যে অভিযুক্ত করা হয়, সেটা ঠিক না। বরং চোরাকারবারিদের সহায়তা না করার কারণে বছর কয়েক আগে আখাউড়া হেড কোয়ার্টারের ইমামবাড়ী স্টেশনের গার্ড মোঃ আলী চোরাকারবারিদের গুলিতে প্রাণ হারায়।' তিনি পাল্টা অভিযোগ করেন পুলিশ ও বিডিআর সম্পর্কে। 'তাদের সহযোগিতায় এ চোরাচালান করা হয়। কিন্তু পুলিশ ও বিডিআর প্রশাসনের চোখকে ফাঁকি দেবার জন্য উল্টো যাত্রীদের হয়রানি করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আখাউড়া, মনতোলাসহ বেশকিছু স্টেশনে অযথাই চেকিংয়ের নামে হয়রানি করা হয়। এতেও বেশকিছু মূল্যবান সময় নষ্ট হয়।'

ঢাকার কমলাপুর স্টেশন থেকে প্রতিদিন ১৬টি আন্তঃনগর ট্রেন ছেড়ে যায়, ১৬টি ট্রেন স্টেশনে এসে পৌঁছে। ১৪টি ট্রেনের গন্তব্য ঢাকা, বাকি দু'টি ঢাকা হয়ে চট্টগ্রাম যায়। উদয়ন ও পাহাড়িকা সিলেট থেকে যাত্রা শুরু করে ঢাকা হয়ে চট্টগ্রাম যায়। অন্যদিকে উপবন, তূর্ণা, একতা, যমুনা, সুবর্ণ, এগারোসিন্ধু প্রভাতী, এগারোসিন্ধু গোধূলি, মহানগর প্রভাতী, মহানগর গোধূলি, জয়ন্তিকা, তিস্তা, পদ্মা, পারাবত, উপকূল– এই ১৪টি আন্তঃনগর ট্রেনের সর্বশেষ গন্তব্যস্থল ঢাকার কমলাপুর স্টেশন। সাপ্তাহিক ২০০০ গত ১৯ থেকে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত এক সপ্তাহে এই ১৪টি আন্তঃনগর ট্রেনের কমলাপুর স্টেশনে পৌঁছার সময়ের ওপর ভিত্তি করে একটি সমীক্ষা করেছে। সমীক্ষায় দেখা যায়, এ সময় মোট ৯৬টি আন্তঃনগর ট্রেনের সর্বশেষ গন্তব্য ছিলো কমলাপুর। এর ভেতর মাত্র ১০টি ট্রেন সঠিক সময়ে স্টেশনে এসে পৌঁছায়। এই সঠিক সময়ে পৌঁছানোর ব্যাপারটিতেও একটি ঘাপলা রয়েছে। ঢাকাগামী একটি ট্রেন কতোটুকু দেরিতে গন্তব্যে পৌঁছায়, সেটা নথিবদ্ধ করার দায়িত্ব রেলওয়ের ট্রাফিক বিভাগের। এই ট্রাফিক বিভাগ থেকে জানা যায়, কোনো ট্রেন দশ/পনের মিনিট দেরি করলেও কাগজে-কলমে সেটা সঠিক সময় হিসেবে দেখানো হয়। এই দশটি ট্রেন তবুও তো সঠিক সময়ে (কাগজে-কলমে!) পৌঁছেছে; কিন্তু বাকি ৮৬টি ট্রেন? এগুলো সঠিক সময়ে তো পৌঁছায়ইনি; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২ ঘন্টা ৫৫ মিনিট, ২ ঘন্টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত দেরি করেছে। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, এর জন্য কখনো, কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ, কোনো রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এ প্রসঙ্গে হাবিবুর রহমানকে জিজ্ঞেস করলে বলেন,'কি যে বলেন ভাই। কার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবো?' তার মতে এখানে অবাক হবার কিছুই নেই। এটাই বর্তমান বাংলাদেশের প্রশাসনের অবস্থা। উপরের বক্তব্যে বোঝা যায়, প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মানসিকতা। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ধারণা আর সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার ওপর নির্ভর করে কর্মকর্তারা প্রশাসন চালাতে চান। আদমজীর ক্ষেত্রেও দেশবাসী এরকম ঘটনাই প্রত্যক্ষ করেছে। অপরাধ করেছে শ্রমিক-কর্মকর্তা সবাই; কিন্তু শাস্তি হয়নি কারো। ফলে দিন দিন প্রতিষ্ঠানটি রুগ্ন হয়েছে। এক সময় মরেও গেল। দেশবাসী এ নিয়ে একবারও প্রতিবাদ করলো না। কারণ তারা দেখেছে প্রশাসনের দুর্বল, ভঙ্গুর, অপরাধপ্রবণ মানসিকতা ও অস্বচ্ছতা। কিন্তু এভাবে কি একটি প্রতিষ্ঠান সফলভাবে চলতে পারে? উত্তর হচ্ছে অবশ্যই নয়। গতিশীল, জবাবদিহিতা ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ও প্রশাসনের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অবশ্যই এ ধরনের মানসিকতা বদলাতে হবে।

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**